

# লোকসমাজ ও লোকচিত্র

সুধীর চক্রবর্তী



# লোকসমাজ ও লোকচিত্র

সুধীর চক্রবর্তী

দ্বিতীয় সংস্করণ

১০বি কলেজ রো কলকাতা ৭০০ ০০৯

স্বত্ব : প্রবর্তক সেন

দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০১২

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৯

প্রকাশক : গুণেন শীল, পত্রলেখা ১০ বি কলেজ রো কলকাতা ৯

মো ৯৮৩১১১০৯৬৩

বর্ণসংস্থাপক ও মুদ্রক : শেঠ ইনফরম্যাটিভ ১০/১ দেশবন্ধু রোড কলকাতা ৩৫

প্রচ্ছদ ও ভিতরের ছবি : অরুণ সরকার

দাম : ৩০.০০

লোক সমাজ  
ও লোক চিত্র

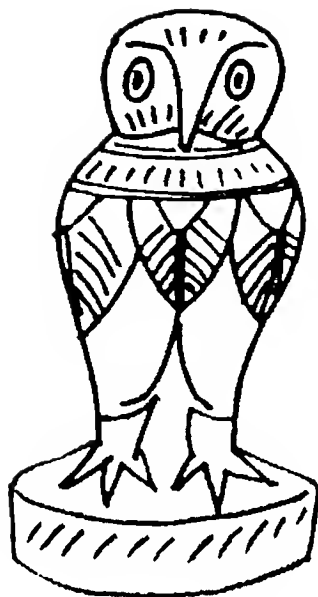
এখানে উপস্থিত শিল্পানুরাগী শান্তিপূরবাসী, আজ এই ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত কক্ষে প্রবীণ ও নবীন শান্তিপূরবাসীদের সামনে শিল্পী ললিতমোহন সেন স্মারক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আপনারা যে আমাকে ডেকেছেন এবং প্রথম স্মারক ভাষণটি আমাকে দিয়ে সূচনা করলেন, এতে আমি খুব গৌরববোধ করছি। যাঁকে নিয়ে আজকে এই অনুষ্ঠান, তাঁর সম্বন্ধে ইতোমধ্যে আপনারা বিস্তারিত শুনেছেন। আশা করি, ভবিষ্যতেও অনেক কিছু জানতে পারবেন। আমার কাজ এই মানুষটির স্মৃতিতে এক সময়োচিত ভাষণ আপনাদের সামনে উপস্থিত করা, যার মধ্যে দিয়ে কিছু কথা আপনারা জানতে পারবেন, কিছু কথা আমিও জানতে পারব। আমাকে যে বিষয়টা বলা হয়েছে—লোকসমাজ ও লোকচিত্র—সে বিষয়ে বলবার মতো সরেজমিন অভিজ্ঞতা আমার কাছে।

দুর্গাঠাকুরের পিছনে যে-চালচিত্র থাকে, চালচিত্রের চিত্রকলা নিয়ে বেশ বড় ধরনের গবেষণা করেছিলাম এক সময়ে, একটা বইও ও বিষয়ে আমার আছে। ‘চালচিত্রের চিত্রলেখা’—এ বিষয়ে সম্ভবত একমাত্র বই। চালচিত্রের চিত্রকলা নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে এক সময়ে সারা পশ্চিমবঙ্গের অনেক গ্রামে ও জনপদে আমায় ঘুরতে হয়েছিল এবং ঐ শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে লোকশিল্প

ও লোকচিত্রকলা সম্পর্কে কিছু সরেজমিন অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। সরেজমিন এই অভিজ্ঞতার ওপর আমি জোর দিচ্ছি এই জন্য যে, আমাদের বিদ্যা দু-রকম ভাবে অর্জিত হয়। একটা হচ্ছে পুঁথিপড়া বিদ্যা, আর একটা হচ্ছে সরেজমিন অভিজ্ঞতালব্ধ বিদ্যা। দ্বিতীয়টির অধিকার যার মধ্যে আসে, তার কাছে পুঁথিগত বিদ্যার মূল্য অনেকটা যাচাই হয়ে যায়।

আমি একটু গল্পের ছলেই আরম্ভ করি। অগ্রদ্বীপ নামে বর্ধমান জেলার একটা বিখ্যাত জায়গা আছে, যেখানে বহু কাল ধরে একটা মেলা হয়। তার নাম গোপীনাথের মেলা। সেখানে যেতে গেলে কাটোয়া হয়ে যেতে হয়। নবদ্বীপ হয়ে কাটোয়া পেরিয়ে অগ্রদ্বীপ স্টেশন থেকে আড়াই কি.মি. দূরে মেলাটা হয়। সেই জায়গার নাম কিন্তু অগ্রদ্বীপ নয়। স্টেশনটার নাম অগ্রদ্বীপ। অগ্রদ্বীপ স্টেশনের বাঁদিকে যে গ্রামটা আছে, সেই গ্রামের নাম নতুনগ্রাম। আর অগ্রদ্বীপের আগে কাটোয়ার দিকে যেতে যে গ্রাম, তার নাম দাঁইহাট। দাঁইহাটের গায়েই গঙ্গা নদী। গঙ্গা নদীর ওপারে গেলে দেখা যাবে, সেখানে আছে প্রচুর পিতল ও কাংস্যশিল্পী। সারা বাংলায় যত জায়গায় যত মন্দির বা গৃহে যত অষ্টধাতুর মূর্তি দেখেন, যত পিতল-কাঁসার মূর্তি দেখেন, কৃষ্ণ-রাধা ইত্যাদি, সমস্তই প্রধানত মাটিয়ারি গ্রামে হয়। যত পাথরের মূর্তি দেখা যায়, তার বেশির ভাগ দাঁইহাটে হয়। যত কাঠের কাজ দেখেন, সমস্তই হচ্ছে নতুনগ্রামে। বাড়িতে পেঁচার বা শ্রীগৌরাসঙ্গের যে মূর্তি আমরা রাখি, যে কোনো মেলায় গেলেই দেখবেন, পথের ধারে বসে বিক্রি হচ্ছে শ্রীগৌরাসঙ্গ আর পেঁচা। আরও অনেক মূর্তি ওরা করে।

এই নতুনগ্রাম হচ্ছে অগ্রদ্বীপের পাশে একটা গ্রাম। এই গ্রামে আমি বছবার গিয়েছি। আমি যখনই অগ্রদ্বীপে যেতাম, ট্রেন থেকে নেমে নতুনগ্রামে আগে ঢুকতাম। নতুনগ্রামে গিয়ে তাদের কাষ্ঠশিল্পীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তার পরে অগ্রদ্বীপে মেলায় যেতাম। কারণ অগ্রদ্বীপে তো আমি সারা দিন সারা রাত্রি থাকব। নতুনগ্রামে যারা কাঠের পেঁচা তৈরি করে, তাদের সঙ্গে দিনের পর দিন মিশে দেখলাম যে একটা কাঠকে তারা টুকরো করে নিচ্ছে ছোটো এক রকম হাতকুড়ুল দিয়ে। হাতকুড়ুলের ছোটো ছোটো স্ট্রোক দিচ্ছে, আর কাঠের চল্টা কেটে বেরিয়ে আসছে। এইভাবে একটা পেঁচার আকৃতি তৈরি হল খুব নৈপুণ্যের সঙ্গে। দেখলে মনে হয়, সৃজনের ঐ হাতটা আমার নেই কেন! ঐ যে ছোট্ট একটা স্ট্রোক থেকে কাঠের চল্টা বেরিয়ে তৈরি হয়ে যাচ্ছে অবয়ব, যার থেকে একটা পেঁচা তৈরি হচ্ছে—মনে হল, এটা অনেক জন্মের দক্ষতা, কয়েক প্রজন্মের দক্ষতা। যিনি পেঁচাটা তৈরি করেছেন, তাঁর বাবা করেছেন, তাঁর বাবা করেছেন, তাঁর ঠাকুরদাও করেছেন। কথা হচ্ছে, ঠিক যেভাবে চার পুরুষ আগে পেঁচাটা হত, এখনও ঠিক একইভাবে পেঁচাটা হচ্ছে। একই বর্ণ, একই রং, একই ধাঁচ। দেখেই বোঝা যায় যে এটা নতুনগ্রামের পেঁচা। টিপিক্যাল যাকে বলে। মনের মধ্যে একটা চিন্তা জাগে, আচ্ছা, পেঁচাটাকে অন্যরকম করলে কেমন হত! কয়েকশো বছর ধরে একই ডিজাইনের পেঁচা হচ্ছে—একটা নতুন কিছু করা যায় না! কিন্তু ওদের তা কখনই মনে হয়নি। ওদের মাথার মধ্যে কেউ এ কথা, এই নতুন চিন্তাভাবনা ঢোকায়নি। ওরা তৈরি করে যাচ্ছে, আর বুড়ি ধরে বিক্রি করে দিচ্ছে। ওরা যা তৈরি করছে,





ফড়েরা এসে তা মার্কেটিং করছে, কলকাতার শো-রুমে সাজিয়ে দিচ্ছে। যেটা এখন থেকে কেনা হল দুটাকায়, সেটার ওখানে দাম হল কুড়ি টাকা। শিল্পী কিন্তু কিছু পাচ্ছে না। আমার কাছে এরকম পেঁচার সংগ্রহ আছে। খুব দুর্লভ একটা সংগ্রহ বলব। প্রথম পেঁচাটা দশ ইঞ্চি। তার পরেরটা আট, এ রকম করতে করতে দু ইঞ্চিতে এসে শেষ হয়েছে। আমার মনে হত, যখন কাঠের কোনো মূর্তি তৈরি হচ্ছে, সেই কাঠটা কী কাঠ? জগন্নাথদেবের মূর্তি থেকে শুরু করে যত মূর্তি আমরা দেখি, বেশিরভাগই নিমকাঠের তৈরি।

যেকোনো শিল্পের ভিত্তি কী, সেটা জানা হল প্রথম কাজ। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প এত নিখুঁত হয়েছে কেন? তার কারণ, দোআঁশ মাটি। মাটিটা নদীর মাঝখান থেকে তুলে আনতে হয়। তাতেই অত নিখুঁত আঙুল-টাঙুল হয়। শান্তিপুরের ঠাকুরও ঐ দোআঁশ মাটি দিয়ে হয়। কলকাতার কুমোরটুলিতে যে ঠাকুর তৈরি হয়, তার মাটি উলুবেড়িয়া থেকে নৌকায় এসে কলকাতার ঘাটে দাঁড়ায়। ওখান থেকে মাটি নেওয়া হয়। বছরের পর বছর এ রকমই চলছে। কলকাতার নিজস্ব কোনো উদ্ভূত মাটি নেই। কাজেই শিল্প নিয়ে আলোচনা যখন করতে হবে, তখন তার ভিত্তিগত সমাজবিজ্ঞান আর অর্থনীতির কথা আসবে। নিছক একটা মূর্তি দেখলাম, তারিক করলাম, তাতে তো হবে না। তার ভিতটা জানতে হবে। জানতে গিয়ে দেখা গেল, ঐ বিশেষ দোআঁশ মাটি আছে বলেই কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পটা গড়ে উঠেছে।

এমন নৃস্কল মৃৎশিল্প বাঁকুড়ার হত না। কারণ, বাঁকুড়ার মাটিতে বালি বেশি। সেখানে নিখুঁত আঙুল-টাঙুলগুলো করা যাবে না।

কিন্তু বাঁকুড়াতে পাঁচমুড়ার ঘোড়া তৈরি হয়েছে। নিখুঁত ঘোড়া তৈরি হয়েছে। কিন্তু ঘোড়াটা লক্ষ করলে দেখা যাবে, বাস্তবে যেমন ঘোড়া দেখি, ওটা তেমন ঘোড়া নয়। ওর ঘাড় বেশ লম্বা। পাঁচমুড়ায় আমি গিয়েছিলাম। দেখলাম, ঘোড়া তৈরি করছে চাক দিয়ে। প্রথমে বিশ্বাস হয় না। চারটে পা চাকে তৈরি করল, বডিটা চাক দিয়ে তৈরি করল। তারপরে জুড়ে দিল, রোদে রেখে দিল। তৈরি হয়ে গেল ঐ বাঁকুড়ার ঘোড়া। লম্বা গলা, তাতে পোড়ামাটির রং। কী করে হল? মনে কৌতূহল জাগল, পোড়ামাটির রং হল কেন? তখন জানা গেল, বাঁকুড়ার ঐ পাঁচমুড়া গ্রামের কয়েক বিঘা জমির পাঁচ ফুট পর্যন্ত যে মাটি আছে, সেই মাটি থেকে এই ঘোড়াগুলো তৈরি হয়। এই জমি তারা কো-অপারেটিভ থেকে ধার নিয়ে সরকারের কাছ থেকে কিনে নিয়েছে। এই পাঁচ ফুট জমির লেয়ার যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন কী করবে? বলল, তখন এই শিল্পটা উঠে যাবে। কারণ, আমরা কো-অপারেটিভ থেকে যে টাকা ঋণ নিয়েছিলাম তা শোধ করতে পারিনি। আমাদের আর কেউ লোন দেবে না। অতএব জমি কেনার মতো আর সম্বায়ে তেমন উৎসাহ নেই। ফলে, একদিন বাঁকুড়ার ঘোড়া উঠে যাবে। গেলাম তাদের কারুশালায়। যাকে পোয়ান বলে, যাতে মূর্তি পোড়ায়, দেখলাম। সেই পোয়ান থেকে পোড়ামাটি রঙের ঘোড়া বেরিয়ে আসছে, হাতি বেরিয়ে আসছে। কালো রঙের মূর্তিও আছে। আমি বললাম, কালো রংটা কী ভাবে করছেন? ওতে আবার কালো রং করছেন নাকি? বলল, না বড়-বড় হাঁড়ির মতো তৈরি করে তার মধ্যে ঘোড়াগুলো পুড়ে দিয়ে একটা ধোঁয়ার মধ্যে ফেলে দিচ্ছি। যেই আগুনের জ্বাল ওর মধ্যে যাচ্ছে, কার্বন গ্যাসের

সংমিশ্রণে ও রকম কালো বর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম, এ তো মহেঞ্জোদাড়োর পদ্ধতি। সেই আমল থেকেই এই পদ্ধতি চলছে। মূর্তির মধ্যে দিয়ে কালো তৈরি করা, কার্বন তৈরি করা—এ খুব পুরনো অভ্যাস মানুষের। কাজেই লোকশিল্পের অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি স্তরে-স্তরে লোকজীবনের গহনে চলে যাচ্ছি, ইতিহাসের ভিতর চলে যাচ্ছি। বিস্মিত হচ্ছি দেখে যে, এই শিল্পীরা কী গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের লোকশিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমরা তাদের করুণা করে বাড়িতে কয়েকটা মূর্তি সাজিয়ে রাখছি মাত্র। কিন্তু এরা কী করে বেঁচে আছে? কী খাচ্ছে? এদের শিল্পটা উঠে গেলে কী ভাবে বেঁচে থাকবে এরা? আমাদের এ রকম কোনো চিন্তা নেই।

আমি নতুনগ্রামের কাষ্ঠশিল্পীদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তাদের গিয়ে বললাম, দেখুন ঐ যে পেঁচাগুলো কিনেছিলাম, তা কী কাঠের? বলল, দেখুন নিমকাঠও নেই, গামারিকাঠও নেই। কেনার পয়সা নেই যে! তাই পিটুলিকাঠ দিয়ে আমরা গড়ে দিয়েছিলাম। পিটুলিকাঠ কি আর টেকে! ওতে ঘুন ধরে যায়। ‘কিন্তু আমার যে একটা দু ইঞ্চি মূর্তি দরকার। কী উপায়!’ বলল, ‘ঠিক আছে, আপনার যখন এমন একটা ইচ্ছা হয়েছে, আপনি পাবেন।’ বললাম, ‘কিন্তু কোথায় পাব? একটা দিন না।’ বলল, ‘এটা কি দোকান নাকি যে বললেন আর দিয়ে দেব! কিছুই নেই, দেখুন তাকিয়ে।’ আমি বললাম, ‘তা তো বটেই।’ ‘আর আপনি যেমন সেট তৈরি করছেন, এমন সেট তো কিনতে পাওয়া যায় না। আপনি আস্তে আস্তে সংগ্রহ করেছেন কয়েক বছর ধরে। আপনার দু-ইঞ্চি একটা মূর্তি দরকার—এই তো কথা। ঠিক



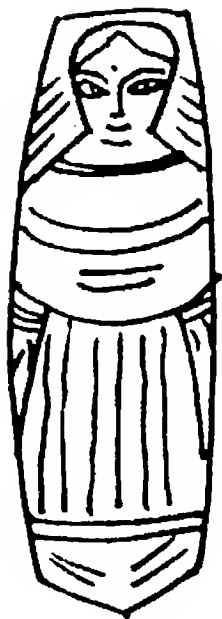
আছে, পেয়ে যাবেন।' আমি বললাম, 'কী করে পাব?' বলল, 'আপনি  
 তো মেলা দেখে কাল সকালে বা বিকেলে আসবেন, পেয়ে যাবেন।'  
 'কোথায় আছে, দেখান না।' হাত তুলে দেখালেন। 'এই আমার  
 হাতের মধ্যে আছে।' আমার খুব রোমাঞ্চকর ভাবে মনে আছে,  
 একটা লোক আমার দিকে তাকিয়ে বলছে, গ্রামের একদম গরিব  
 একটা লোক গর্বিত ভঙ্গিতে বলছে, 'পেঁচাটা আমার হাতের মধ্যে  
 আছে।' আমি দেখলাম, এ অহঙ্কার করার মতো ক্ষমতা আমার নেই।  
 আমার হাতের মধ্যে কিছু নেই। থাকলে মগজের মধ্যে কিছু হয়তো  
 আছে, তাও পুঁথিপড়া বিদ্যা। ঐ লোকটা কিন্তু বলল, 'আমার হাতের  
 মধ্যে আছে,' বলেই বলল, 'এই, দু ইঞ্চি একটা কাঠ কেটে আন  
 তো।' তার ছেলে সঙ্গে-সঙ্গে কুড়ুল দিয়ে কেটে একটা কাঠের টুকরো  
 আনল। চৌকো ঐ কাঠটা কুড়ুল দিয়ে কেটে শিল্পী পেঁচাটা বানিয়ে  
 ফেলল। বানিয়ে বলল, 'বউ, খড়ি করে দে।' বউ খড়ি করে রোদে  
 দিয়ে দিল। 'বিকেলবেলা রং করে দিস।' বিকেলে আমি যখন গেলাম,  
 তখন দেখলাম, রং করে দিয়েছে। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা সবাই  
 শিখে ফেলেছে। আমায় একটা দু ইঞ্চি পেঁচা দিয়ে দিল। আমি বললাম,  
 'এটার কী দাম দেব?' বলল, 'এর তো কোনো দাম দেওয়া যাবে না।  
 আপনি ভালোবেসে নিতে এসেছেন এত দূর। এর আবার দাম হয়  
 নাকি?' তখন আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এ অমূল্য। এ আমি কোনো দাম  
 দিয়ে আপনার কাছ থেকে কিনতে পারব না। সে টাকা আমার কাছে  
 নেই। সেই কারেন্সি এখনও বেরোয়নি।' তা, এ লোকের কাছে  
 তখন একটু অপরাধী বোধ করলাম, গর্বিতও বোধ করলাম। আমার  
 দেশবাসী, আমার সঙ্গেই থাকে, তাকে চিনি না। চিনলাম, তখন মনে

হল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথা। তিনি বলেছিলেন যে, 'লোকশিল্পের যদি উন্নতি করতে হয়, তাহলে হেড অ্যান্ড হ্যান্ডের মধ্যে একটা যোগাযোগ করতে হবে। মগজ এবং হাতের মধ্যে। অর্থাৎ এ লোকগুলোকে শিক্ষিত করতে হবে।' এই কারুশিল্পী, চারুশিল্পীরা যদি শিক্ষিত হতে পারে, মাপজোক শিখতে পারে, সব রকমের জ্ঞান অর্জন করতে পারে, তা হলে দেখা যাবে, শিল্পকে ভেঙে, শিল্পের ভেতরকার ভারসাম্য ভেঙে শিল্পের নতুন চেহারা তৈরি করবে এবং গতানুগতিক যে শিল্প কয়েক শতক ধরে চলছে, তা ভেঙে দিয়ে একটা কাঠ থেকে নতুন রকমের একটা পেঁচা বার করে আনবে। কিন্তু সেটাই হল না। পায়ের তলায় মাটি নেই, অর্থনীতির ভিত নেই, কিছু করার সাহস নেই।

সেই যে ছোটোবলো থেকে কাঠের পুতুল দেখছি, সেই যে বউ-পুতুল, সে আজও দেখছি একই রকম। এখনও সেই কাঠের পুতুল, এখনও সেই পেঁচা, এখনও সেই গৌরাঙ্গমূর্তি। এটার একটু এদিক-ওদিক হল না কেন? এর কারণ, তাদের হেড অ্যান্ড হ্যান্ড-এর মধ্যে যোগাযোগ আমরা তৈরি করতে পারিনি। আমরা যা করতে পারতাম, পাঁচমুড়ার কয়েক জন যুবককে নিয়ে এসে কৃষ্ণনগর শহরের মৃৎশিল্পীদের মধ্যে রেখে দিতে পারতাম। এমন কিছু খরচ নয়। অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রচুর এন জি ও আছে। চারটে ছেলেকে ডেকে এনে রাখা যেত শহরে। এই যেমন ললিতমোহনকে নিয়ে যাওয়া হল ইংল্যান্ডে। তেমন পাঁচমুড়ার চারটি যুবককে এনে যদি বলা হত, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পটা দেখো তো। রিয়ালিস্টিক এর সঙ্গে যোগ করো। আর কৃষ্ণনগরের চারটি ছেলেকে পাঁচমুড়ায় নিয়ে

গিয়ে বলা যেত, তোমার রিয়ালিস্টিকটা ভাঙে। তোমাদের ঘোড়া ঘোড়ার মতোই দেখতে হয়, যদি একে এদিক-ওদিক একটু করো। তোমরা যে রিয়ালিস্টিকের বাইরে একটুও এদিক-ওদিক করতে পারো না, সেটা তো ভাঙা দরকার। দেখো, কী ভাবে এরা ভাঙছে। এ ভাবে পাঁচমুড়া ও কৃষ্ণনগরের মধ্যে একটা লেনদেন হয়ে যেত। আমরা না হয় কিছু টাকাপয়সা দিতাম। এমন সংস্থা তো গড়ে তোলা যায়। এর ফলে হত কী, দু-জায়গার শিল্পই সমুন্নত হত। লোকশিল্পের মূল ভিত্তি হচ্ছে আত্মপ্রত্যয়, জন্মার্জিত সংস্কার, দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহিত শিল্পবোধ—এগুলো তারা পেয়ে গেছে। কিন্তু তার আগে তো দরকার লোকসমাজ।

লোকসমাজ বলতে গিয়ে প্রথমেই যেটা মনে হয়, সেটা সংস্কৃতির কথা। আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে একটা হচ্ছে হাই-কালচার, একটা লো-কালচার, আর একটা পপুলার কালচার। এগুলো সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন। হাই কালচারটা আমরা যা আন্দাজ করতে পারি, তা হল সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি। ব্রিটিশ যুগের বড়লোকেরা যে-সংস্কৃতির চর্চা করে গেছেন, পোষকতা করে গেছেন—সেটাই হাই-কালচার। আর লো-কালচার বলতে তারাই, যাদের আমরা লোকশিল্পী বলি, লোকসংস্কৃতি বলি। মাঝখানে রয়েছে পপুলার কালচার। এই কালচারের যুগ হচ্ছে বিশ শতক। সিনেমা হল-এ গেলে পপুলার কালচার দেখা যাবে। কেউ কখনও সুস্থ ভাবে নাচছে না, কেউ স্থির দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে পারছে না। পপুলার কালচার আমাদের যা দিতে চাইছে আর আমরা যা পপুলার কালচারের কাছ থেকে নিতে চাইছি, দুটোই উৎকট। পপুলার কালচার মানে হচ্ছে





মধ্যবিস্তারের বিচিত্র খেয়ালের রুচি, বিকৃত রুচি। যেমন পোশাক, তেমনই নাচ-গান। তার সঙ্গে আজকাল হয়েছে রিয়ালিটি শো। ছোট্টো ছোট্টো ছেলেমেয়েদের বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি পোশাক পরিয়ে নাচাচ্ছে। বাবা-মায়ের মুখে কী হাসি! যিনি অ্যাক্টর, তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন, বাবা-মা এসেছেন তো। বাবা-মা কৃতার্থ ভাবে হাসেন।

কেন কৃতার্থ, বুঝতে পারি না। পপুলার কালচারের বীজ যদি আমাদের মধ্যে একবার গেড়ে বসে, তা হলে লোকশিল্প মরে যাবে। লোকশিল্প যে মরে যাচ্ছে, তার কারণ লোকসমাজটা নষ্ট করে ফেলেছি আমরা। ফোক সোসাইটি, আরবান সোসাইটি, দুটো আলাদা কথা। একদিকে রয়েছেন ভদ্রলোক, আর একদিকে ফোক বা সাধারণ মানুষ। আমরা মাঝখানে থেকে পপুলার কালচারের চর্চা করব। ঐ, টিভি দেখব, সিনেমা দেখব। অদ্ভুত-অদ্ভুত লোকের জীবনী পড়ব। স্ক্যান্ডাল হল পপুলার কালচারের একটা বিষয়। যার যত স্ক্যান্ডাল, সে তত পপুলার।

সুতরাং এ একটা অদ্ভুত সময় এসেছে, যখন লোকসমাজ সম্বন্ধে একটু বুঝতে হবে। সমাজের দুটো ব্যাখ্যা সমাজবিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। একটাকে বলছেন সোসাইটি, আর একটাকে বলছেন কমিউনিটি। ভালো করে বুঝে দেখি যে, আমরা সোসাইটির মধ্যে আছি, কমিউনিটির মধ্যে নেই। সোসাইটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আমরা কেউ কাউকে চিনি না। আমরা কেউ কারওর দুঃখে-বেদনায় তেমন করে বেদনার্তও হই না। আমরা সমালোচনা করি বা খুঁত কাটি। লোকের রাজনৈতিক বা সামাজিক অসুবিধা হলে তা নিয়ে পরিহাস করি।

কিন্তু কমিউনিটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যেকোনো বিপদ-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়া। গ্রামের মধ্যে যখন আগুন লাগে, হিন্দু-মুসলমান তো সব পাশাপাশি কুঁড়েঘর করে আছে, আগুনটা নেভানোর জন্য হিন্দু-মুসলমান সবাইকে দরকার। কেউ জল বলে, কেউ পানি বলে। কিন্তু আগুন না-নেভাতে পারলে সবারই কুঁড়েঘর পুড়ে যাবে। তখন যে বোধটা জেগে ওঠে, সেটাকে বলা যায় কমিউনিটি সেন্স।

দু'হাজার সালের বন্যা দেখেছিলাম নদিয়ার তেহট্ট অঞ্চলের একটা গাঁয়ে। নৌকায় করে যেতে-যেতে দেখলাম, সমস্ত গ্রাম ডুবে গেছে। খালি একটা মসজিদে জেগে আছে। মসজিদের গম্বুজের ওপর আশপাশের পরিবার সব বাস করছে। তার মধ্যে আবার একটা বাচ্চাও হয়েছে। তারা বলল, 'কাল থেকে আমরা গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সবাই মিলেই তো এখানে আছি। বন্যা হয়েছে। আল্লা যেখানে রেখেছেন, সেখানেই আছি। ওরাও আছে, আমরাও আছি। রান্না করছি, খাচ্ছি। এখানে ছোঁয়াছুঁয়ি, ধর্মাচার করলে তো চলবে না, বাঁচতে হবে।' 'তা বাচ্চাটার নাম দিলাম মসজিদ খাঁ। ঐ নাম থেকে গেল। বন্যার চিহ্ন থেকে গেল ওর মধ্যে।' সম্প্রতি গ্রামের মধ্যে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান নিয়ে চর্চা করতে গেলে গ্রামের লোকদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা কেমন আছো? —জানায়, 'ভালোই আছি, কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা তো তোমাদের শহর নিয়ে। আমরা ভালোই আছি।' এর পর একটা কথা বলেছিল মারাত্মক, 'দোহাই বাবু, সম্প্রীতির হাত থেকে আমাদের বাঁচান। আপনারা সম্প্রীতি বলে কী বলতে আসেন মাঝে-মাঝে, ঐটা নিয়ে বড় বিপদে পড়ে গেছি। ঐটা আমাদের বরাবরই আছে। কিন্তু কেন জানি না,

সম্প্রীতি-সম্প্রীতি করে আজকাল এমন চিংকার ওরা করছেন। আপনাদের শহরে গিয়ে আগে সম্প্রীতি তৈরি করুন, তারপর আমাদের এখানে আসবেন।' এই হল লোকসমাজ।

'কমিউনিটি' বোঝাতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, একজন মাঝি নৌকো পার করেছে, আর তাতে একজন তাঁতি যাচ্ছে। তাঁতি পার হয়ে বলল, 'এই তোমাকে আর পয়সা দিলাম না, বুঝলে। বার-কয়েক পার করে দিও, তোমায় একটা গামছা বুনে দেব।' মাঝি বলল, 'ঠিক আছে, সেটাই ভালো হবে।' ঠিক তেমনি করে যে চাষ করে, সে কামারকে বলল, 'এই, আমায় একটা ফাল বানিয়ে দিও তো। আমার ফালটা কেমন ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।' 'তা দেব। তুমি আমায় কী দেবে?' চাষি বলল, 'তা কী আর দেব, খানিকটা ধান দিয়ে দেব 'খন।' এই হল পারস্পরিক বোঝাপড়া মাঝির সঙ্গে কামারের, তাঁত শিল্পীর সঙ্গে কুমোরের। কমিউনিটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রত্যেকে প্রত্যেককে জানে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে জড়িত। এবং অন্তরমহলের সঙ্গে জড়িত।

আমাদের অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী বলেছিলেন, 'যখন আমি একটু বড় হলাম, আমার হাতে খড়ি হবে। তা আমাদের খুলনার গ্রামে ওকে হাতে খড়ি বলত না, বলত কাগজ ধরানো। কাগজের ওপরে লেখানো হত। আমার বাবা ছিলেন বৈদিক ব্রাহ্মণ, খুব পণ্ডিত মানুষ। তিনি গ্রামের রহিম মাস্টারকে ডেকে এনেছিলেন, 'রহিম, তুমি আমার ছেলেকে কাগজ ধরিয়ে দাও তো।' তা রহিম মাস্টার কাগজ-কলম নিলেন, নিয়ে প্রথমে লিখলেন, শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়। তারপরে লিখলেন, এলাহি ভরসা। এর পর বললেন, 'প্রথমটা



তোমার কথা, দ্বিতীয়টা আমার কথা, দুটো একই কথা।’ জনার্দনবাবু বলছেন, ‘তিন-চার বছর বয়সেই শুনলাম; শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় আর এলাহি ভরসা একই কথা। একটা তোমার কথা, একটা আমার কথা, দুটোই এক কথা।’

এই জনার্দনবাবুর বাবা মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। রাত্রিবেলা তাঁর এক বন্ধু ইয়াকুব এসেছেন পাশের গ্রাম থেকে। জনার্দনবাবু বলছিলেন, আমরা তাঁকে ইয়াকুব চাচা বলতাম। ইয়াকুব চাচা রাত্রিবেলা লঠন হাতে করে এসে বাবাকে ডাকছেন, ‘আছে নাকি?’ ‘হ্যাঁ, কী ব্যাপার? এত রাতে এসেছ কেন?’ বললেন, ‘আমার তো মেয়েটার বাচ্চা হল, তার সূতিকা জ্বর হয়েছে। কাঁচা দুধ চাই। গরুর কাঁচা দুধ চাই। হিসেব করে দেখলাম, তোমার বাড়িতে গাইগরু আছে। তুমি তার কাঁচা দুধ দিতে পারো?’ জনার্দনবাবু বলছেন, ‘আমার বাবা বললেন, দেখো, দুধ তো আছে, দেওয়া উচিত। কিন্তু দুধ দোওয়ার লোক তো আসবে কাল বেলা দশটায়। দুধ তো কোনোদিন দুইনি আমি। ইয়াকুব, গরু আছে, দুধ দোওয়ানোর লোক নেই। কী করে দোব?’ ‘সে তো বটে, ঠিকই। কী আর করা যাবে। সবই আল্লার ব্যাপার। কপাল! মেয়েটা বাঁচবে না। সূতিকা জ্বর হয়েছে।’ ইয়াকুব চলে গেল। এবার, জনার্দনবাবু বলছেন, আমার বাবা পায়চারি করতে লাগলেন, ঘুরছেন, এদিক-ওদিক করছেন। ‘তাই তো, জনার্দন, মেয়েটা মরে যাবে! ও মেয়ে তো আমারও মেয়ে। কিছু একটা করা যায় না? আয় তো। পাঠনটা নিয়ে একবার গোয়ালঘরে যাই।’ গোয়ালঘরে গেলাম, আমি পাঠন ধরলাম। বললেন, ‘তুমি এক কাজ করো, তুমি গরুর পা-দুটো চেপে ধরো দিকিনি।’ বলে বালতি নিয়ে চেষ্টা করতে দুধ বেরল।

খানিকক্ষণ পরে অনেকটাই বেরল। উনি বললেন, ‘এই তো। পারা যাবে না কেন? মানুষ পারে, আমি পারব না! চলো। লঠনটা নাও, যাই।’ ইয়াকুব চাচার বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম এক ঘণ্টা পরে। ইয়াকুব চাচা, ইয়াকুব চাচা বলে ডাকতে উনি বেরিয়ে এলেন। বাবা বললেন, ‘কাঁচা দুধ পাওয়া গেছে।’ ‘কোথায় পেলে?’ ‘আমরাই দুইলাম। তোমার মেয়ে মরে গেলে তো আমার মেয়ে মরে যাবার মতোই কষ্ট হবে।’

এই যে গল্পটা, এটা সোসাইটির গল্প নয়, কমিউনিটির গল্প। হিন্দু-মুসলমান দুটো বিধর্ম, কিন্তু কমিউনাল সেন্স খুব আশ্চর্য—যে, আমরা একই জায়গায় আছি। একই আনন্দের মধ্যে আছি, একই বেদনার মধ্যে আছি, পরস্পরের সুখের মধ্যে আছি, পরস্পরের আপদকালে দাঁড়াবার মতো প্রবৃত্তি নিয়ে আছি। আমাদের কমিউনালিটি নেই।

বাঁকুড়ার পাঁচমুড়াতে একবার গিয়েছিলাম আমি। আমার স্ত্রীকেও নিয়ে গিয়েছিলাম। যাতে নাকি অন্দরমহলে গিয়ে একটু কাজ করা যায়। আমি তো আসলে কাজ করতে চাই পাঁচমুড়ার শিল্পীদের নিয়ে। তা বাইরে শোকেস-টোকেস সাজানো আছে, আমি গিয়ে দেখছি। ওরা খুব সত্ৰমভরে তাকাচ্ছে যে শহর থেকে মানুষ এসেছেন। আমি খানিকক্ষণ পরে বললাম, ‘একটু মুড়ি-টুড়ি খাওয়াবেন না?’ সঙ্গে সঙ্গে ওরা বলল, ‘আপনি মুড়ি খাবেন আমাদের বাড়িতে?’ আমি বললাম, ‘কেন খাব না?’ ‘তা হলে তো ভেতরে ঢুকতে হয়। কী দিয়ে খাবেন মুড়ি?’ ‘গুড়-টুড় নেই বোধ হয়।’ ‘হ্যাঁ, গুড় আছে।’ তারপর বললাম, ‘আমি কিন্তু ভাতও খাব।’ ‘অ্যাঁ, আমাদের বাড়িতে

আপনি ভাতও খাবেন? তা হলে তো একটা মাছের যোগাড় করতে হয়।' শোলমাছ নিয়ে এল। এ বার আমার স্ত্রী আমাকে বললেন, 'আমি কিন্তু শোলমাছটা খাবো না।' 'কেন বলো তো?' বলল, 'জানো তো, শোলমাছ কুটল-কটল, কিন্তু ধুলো না। না-ধুয়ে হাত দিয়ে এমন করে মুছে কড়াতে ফেলে দিল।' আমি শুনে ওদেরকে বললাম, 'দেখুন, আমার স্ত্রী তো মাছ খান না।' মিথ্যা কথা বললাম। শহরের লোক তো! বলল, 'ঠিক আছে। ওকে আমরা একটা ডিমের মামলেট করে দেবো।' সেটা খেতে গিয়ে আরও বিপদ হল এই জন্য যে, ওরা তো অমলেট করতে জানে না। ফলে একটা পুরনো কালো কড়ার মধ্যে একটা ডিমের লেই দিয়ে এমন এপিঠ-ওপিঠ করল যে কুচকুচে কালো বস্তু একটা বেরিয়ে এল। সেটাই আপাতত মামলেট। কী করা যাবে। কিন্তু মাছের ঝোলটা আমি খেয়ে নিলাম। যখন আমার স্ত্রী আমায় জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'তুমি কী করে খেলে? মাছটা ধোয়নি।' আমি বললাম, 'জায়গাটা তো বাঁকুড়া। এখানকার গ্রামে ঘোরার আমার অভ্যাস আছে, তাই জানি এখানে কোন জল পাওয়া যায় না।' উনি বললেন, 'সে কী?' জলের স্তর নেই-ই। শুধু বালি দেখা যাচ্ছে। কী এক কৌশলে ঐ বালিটাকে সরিয়ে-সারিয়ে একটা বাটি পেতে দিল, সেটাকে আমরা চুঁয়ো বলি। ওরা ওটাকে চোঁ কাটা বলে। চুঁয়ো কেটেছে, সেখান থেকে জলের বিন্দু পড়ছে ওপর থেকে। এক বাটি জল হতে ঘণ্টা-দুয়েক লাগে। তা যাদের এক ঘণ্টা, দু-ঘণ্টায় এক পাটি জল হয়, তারা কীভাবে মাছ ধোবে? সেই কমিউনিটিকে আমরা চিন না। আমার রুচিবোধ দিয়ে আমি বলছি, 'আমি খেতে পারব না। নোংরা লাগছে আমার।' তারা তো বছরের পর বছর খাচ্ছে,





দিনের পর দিন যাচ্ছে। জল নেই। দু-কিলোমিটার দূর থেকে জল আনতে হয় কলসি করে। তবে খাওয়া হয়। সেই পরিবারের মধ্যে গিয়ে পড়েছি। আমরা তো তাদের কমিউনিটির লোক নই। আমি তো তাদের সুখ-দুঃখের কথা কিছু জানি না।

যখন মেদিনীপুর কিংবা বীরভূমের পটুয়াদের কাছে গেছি, পটচিত্র যারা আঁকে সে পটুয়া, তার বাড়ি গিয়ে দেখা গেল, তারা পৌরাণিক ছবি আঁকছে। রাবণবধ, মহীরাবণবধ, সীতাহরণ, সীতার পাতালপ্রবেশ, সব পর-পর এঁকে যাচ্ছে, গুটিয়ে ছবি লাগাচ্ছে আর গান গাইছে। ‘তোমার নাম কী?’ বলল, ‘আমার নাম হচ্ছে সমীর, আর একটা নাম হচ্ছে সমীরুদ্দিন।’ বললাম, ‘সে আবার কী?’ বলল, ‘আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই।’ বলল, ‘আমাদের নামাজ হয়। কবর হয়। কিন্তু আমরা দোল-দুর্গোৎসবে পূজো করি না। কিন্তু দুর্গাষ্টাকুর গড়ি আমরা।’ বিনয় ঘোষমশায় একে বলেছেন যে, ‘কালচারাল অসিলেশন’। যদি যেমন ঘোরে, পাখা ঘোরে, তেমনই কালচারাল অসিলেশন। সংস্কৃতি একবার এদিক যাচ্ছে, একবার ওদিক যাচ্ছে। একবার সমীরের দিকে যাচ্ছে, আর একবার সমীরুদ্দিনের দিকে যাচ্ছে। সে হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। তাকে বললাম, ‘তোমাদের বিয়ে-থার কী অবস্থা?’ বলল, ‘আমাদের পটুয়াদের সঙ্গে পটুয়াদের বিয়ে হয়। আমাদের হিন্দুর সঙ্গে বিয়ে হয় না, মুসলমানদের সঙ্গে বিয়ে হয় না।’ কিন্তু তাদের প্রগাঢ় পৌরাণিক জ্ঞান, তারা আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের সমস্ত গল্প জানে। সমস্ত গল্প তারা এঁকেছে। পটে এঁকে দেখাচ্ছে আর গাইছে। তো, আমি তাদের জিজ্ঞাসা করছি, ‘তোমরা যে ছবিগুলো এঁকেছ, কী করে

এঁকেছ? প্রথমে পট-টার কথা একটু বলো।’ বলল, ‘পুরনো কাপড় তেঁতুলবিচির আঠা দিয়ে জুড়েছি, তার সঙ্গে কাদা লাগিয়েছি। শক্ত হয়েছে, পাথর দিয়ে ঘষেছি, ঘষে প্লেন করেছি, তার পর ছবি এঁকেছি।’ ‘কী দিয়ে আঁকলে?’ ‘তুলি দিয়ে আঁকলাম।’ ‘কীসের তুলি করলে?’ বলল, ‘বোকা পাঁঠার ছাগলের ঘাড়ে যে লোম, তাই দিয়ে খুব সূক্ষ্ম তুলি তৈরি হত।’

দেশীয় কতকগুলো জিনিশ। তুলি করেছে নিজেদের পশু-পাখির কাছ থেকে নিয়ে। ‘রং কোথা থেকে পেলো?’ ‘উনুনে রান্না হয়, রান্না করতে করতে দেখবেন ঝাঁকটা হলদে মতো হয়ে যায়, ঐটা খুঁড়ে নিয়ে জলে ভেজালেই হলদে পাবেন। পুঁই মিচুরি থেকে বেগনি পেয়ে যাবেন। আলতা থেকে লাল, আর হলুদের সঙ্গে নীল কালি দিলে সবুজ পেয়ে যাবেন—এ সব দিয়েই পটের ওপর আঁকি।’ ‘এ রকম কেন?’ জানতে চাইলাম। বলল, ‘কিছু কেনবার তো পয়সা লাগবে।’

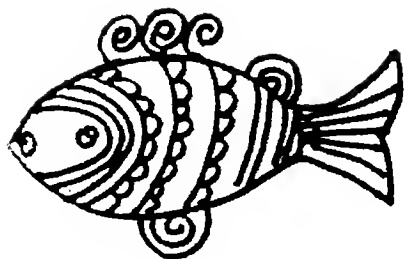
কৃষ্ণনগরের চালচিত্র-শিল্পী ছিলেন শ্যাম পাল। বৃদ্ধ মানুষ। তাঁকে গিয়ে বললাম, ‘চালচিত্র আঁকছেন, একটু দেখাবেন?’ খবরের কাগজ, যা ডেলি পেপার, চালচিত্রের মতো করে কেটেছেন, তার উপর গাঢ় রঙ করে ছবি আঁকছেন। শিব আঁকলেন, দুর্গা আঁকলেন, শিবের বাড়ি আঁকলেন, নন্দী-ভূঙ্গী আঁকলেন। দেখলাম চট-চট করে এঁকে যাচ্ছেন। কোনো ড্রয়িং নেই, কোনো পেন্সিল নেই। ডাইরেস্ট আঁকছেন। ডায়রেস্ট ছবি এঁকে দিলেন। বললাম, ‘কত দাম?’ বলল, ‘আমরা তিন টাকা করে বেচি। কুমোরটুলিতে দশ টাকায় বিক্রি হয়। একটা লোক ঝুড়ি করে একশো-দুশো নিয়ে আশি টাকা করে বেচে।’

তা, এই ছবির মধ্যে অমরত্ব আসবে কোথা থেকে? খবরের কাগজের ওপর সস্তা রঙের যে চালচিত্রের ছবি, তার সৌকর্য, নান্দনিকতার বোধ আমরা কোথা থেকে পাব?

শ্যাম পালের সঙ্গে দিনের পর দিন বসে আমি পুরাণ শিখেছি। তিনি বলতেন, ‘বোস, তোমায় পুরাণের গল্প শোনাই।’ গড় গড় করে পুরাণের গল্প বলতেন, যার আমি অনেকটাই জানি না। আমি বললাম, ‘আমাকে একটা পট এঁকে দেবেন?’ ‘হ্যাঁ, এঁকে দেব।’ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমাকে কী দেবে?’ বললাম, ‘আপনি যা চাইবেন, তা-ই দেব।’ ‘আমি তো তিন টাকার বেশি চাইতে পারব না।’ বললাম, ‘আপনি হাঁপানির রুগি, আপনার ওষুধগুলো আমি কিনে দেব।’ তাঁকে কিছু ওষুধ-বিষুধ কিনে দিলাম, তাতে তিনি খুব খুশি। দশাবতার পট আঁকলেন। আমার কাছে দশাবতার পট অন্তত পঞ্চাশ রকমের আছে। আমি দশাবতার পট প্রচুর যোগাড় করেছি। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির দুর্গাঠাকুরের পিছনে দশাবতারের পট থাকে। দশমহাবিদ্যা আছে।

আমাদের লোকশিল্পের সঙ্গে পৌরাণিক জ্ঞান বহু দিন থেকে জড়িত। তার মধ্যে কমিউনিটিও থাকে না, সোসাইটিও থাকে না। আমরা যারা সোসাইটিতে থাকি, ছেলেমেয়েদের ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দিচ্ছি, তাদের কোন কমিউনিটি সেন্স তৈরি হয়নি। তারা আমাদের পুরাণ জানে না। বড়দিনে তাদের কাছে সান্তা ক্লজ এসে হাজির হয়। আমরা অমন উপহারও কখনও পাইনি।

শ্যাম পাল আমাকে পটে ছবি এঁকে দিয়েছেন দশাবতার, একের পর এক। অবতারগুলো আসছেন রাম-বলরাম-পরশুরাম করতে



কপোত, যেখানে বুদ্ধ এসেছে গৌতম বুদ্ধ ঐকেছেন। আমি বললাম, 'বুদ্ধটা এরকম ঐকেছেন কেন?' দেখলাম, বুদ্ধ বসে আছেন অটোপ্ৰটহারী, দাড়ি, কালো চুল, গলায় মালা। 'বুদ্ধ এরকম কেন?' গলাগেল, 'আপনি কোন্ বুদ্ধ ভাবছিলেন?' 'কেন গৌতম বুদ্ধ?' 'সে তো নির্বাণলাভের পর তিনি গৌতম বুদ্ধ হয়েছিলেন। তার আগে তো তিনি হিন্দু রাজা। যেখানে দশাবতার, সেখানে তো হিন্দু রাজা, এই ভাবেই তো আমরা দেখি।' এই দেখার মধ্যে একটা বিপ্লব আছে। পটের মধ্যে যে একটা বিদ্রোহ আছে, তা প্রথম শ্যাম পালকে দেখে শিখলাম। শ্যাম পাল বললেন, 'এগুলো সব বুঝে নাও, শিখে নাও। আমি তো মরে যাব, আমার তো কোনো ছেলেমেয়ে নেই, আমি মরে গেলে এই পটের কথা তোমাকে কেউ বলতে পারবে না।' আমি ভাগ্যক্রমে শ্যাম পালের কথা সব শুনে নিয়েছি, লিখেও ফেলেছি। তা, এই ভাবে যে কালচারাল অসিলেশন এর মধ্যে ঢুকে পড়লাম, দেখলাম, শ্যাম পাল আঁকতেন এক রকমের ছবি। পটুয়ারা, মেদিনীপুরে-মুর্শিদাবাদে-বীরভূমে গ্রামের মধ্যে ঢুকে দেখেছি, পটুয়ারা ঐ কালচারাল অসিলেশন এর মধ্যে পড়েছে। তারা না হিন্দু, না মুসলমান। তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাহ হচ্ছে, আস্তে আস্তে বাস্তব ত্যাগ করছে। আস্তে আস্তে বৃত্তি ত্যাগ করছে।

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের পরিবারের মধ্যে ঢুকে গিয়ে মৃৎশিল্পীর মা কে জিজ্ঞাসা করেছি, 'আপনার ক' ছেলে?' 'চার ছেলে।' 'আপনার ছেলেরা সব মাটির কাজ করবে, তা ইচ্ছে করে তো?' বলল, 'না। ছেলেদের সব লেখাপড়া শিখিয়েছি।' বললাম, 'কেন?' বললেন, 'মাটির কাজ করলে খেতে পেত না জীবনে। বিয়ে হয়ে এ বাড়িতে

এলাম, দেখলাম আমার স্বামী খেতেই পায় না। ঠাকুর গড়ে কোনো রকমে বেঁচে আছি।' কুমোরদের নিয়ে একটা বিখ্যাত প্রবাদ আছে, 'নিশ্চিন্তে শুতে কুমহারা/মাটি না লায় চোর'। কুমোর একমাত্র দরজা খুলে ঘুমোতে পারে, কারণ মাটি তো চুরি করে না। এ হচ্ছে কুমোরদের সম্বন্ধে প্রবাদ। তা বলছে, 'সেই বাড়িতে বিয়ে হয়েছে, বুঝতে পারছেন তো। জীবনে কখনও একটা গয়নাও পেলাম না। ছেলেদের আর সর্বনাশ করব না, তাই লেখাপড়া শেখাচ্ছি।' ঠিক এই জায়গায় পুরো সমাজবিজ্ঞানীর মতো প্রশ্ন করলাম, 'সব ক-টা ছেলেই অফিসে চাকরি করবে? সাত-পুরুষের, বাবার বিদ্যা একজনও রাখবে না।' একটু গর্বিতভাবে সে বলল, 'একটা ছেলেকে বাবার কাজ শেখাচ্ছি।' সমাজবিজ্ঞানী এইখানে গিয়ে একটু স্বস্তির জায়গা পাবে। একটা ছেলে অন্তত শিখছে। সবই বৃত্তিত্যাগ করে চলে যায়নি। তা, এই যে সেন্স অব কমিউনিটি—যে, আমি মৃৎশিল্পী সমাজের লোক, আমি তপ্তবায় সমাজের লোক, আমি কাষ্ঠশিল্পী, সেই জন্যেই তাদের যে ললিতকলা, তা থেকে যাবে।

প্রধানত ফাইন আর্টস বলতে পাঁচটা জিনিস বোঝায়। প্রথমে হচ্ছে নাচ, তারপর হচ্ছে ছবি, তারপর ভাস্কর্য, তারপর গান, তারপর সাহিত্য। এই হচ্ছে ললিতকলা। প্রথমেই নাচ কেন? আদি মানব বা গুহাবাসী মানব প্রথমে অরণ্যের মধ্যে শুরু করল তাদের জীবন, তখন কিছু একটা শিকার করতে পারলে সেই শিকার করা পশুটাকে আগুনে জ্বালানো হচ্ছে, পোড়ানো হচ্ছে, সেই দক্ষ মাংস খাওয়া হবে। এই যতক্ষণ দক্ষ হচ্ছে, সেটা তো আধঘণ্টা-একঘণ্টার ব্যাপার, ততক্ষণ এই মানুষগুলো কী করছে? নিজেরা নিজেরা গোল হয়ে

যুগে যুগে আনন্দ প্রকাশ করছে, কাজেই নাচই হচ্ছে প্রথম ললিতকলা ।

মানুষ তার অঙ্গ দিয়ে প্রথম শিল্প সৃষ্টি করেছে । তারপর দেখা গেল, গুহার মধ্যে হাতে এমন ছবি আঁকেছে, এমন রিয়ালিস্টিক ছবি আঁকেছে, প্রাচীন গুহাচিত্র দেখলে দেখবেন, একটা হরিণ হরিণের মতোই আঁকা আছে । তাই দেখে হরিণ ভুল করে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ল আর খপ করে তাকে ধরে ফেলল । চিত্রকলা হচ্ছে মানুষের দ্বিতীয় সৃষ্টি । তারপর সৃষ্টি হচ্ছে ভাস্কর্য ও গান, তারপরে হল সাহিত্য । সাহিত্য হবে যখন অক্ষর সৃষ্টি হবে, ব্যাকরণ তৈরি হবে । ছাপা তৈরি হবে বা হাতের লেখা তৈরি হবে, তারপর তো সাহিত্য । কাজেই ললিতকলার ক্ষেত্রে আমরা চিত্রকলাকে খুব উঁচু জায়গায় রাখি । কারণ আদি মানুষ থেকে আজ পর্যন্ত কোনো শিশুর সামনে যদি একটা পেঙ্গল দেন, দেখবে সে কিন্তু যা হোক কিছু একটা আঁকে দেবে । ‘এইটা একটা ঘোড়া’ বলে একটু অন্তত ছবি আঁকে দিল সে । সেটা ঘোড়া নয়, কিন্তু তারপর বলি, ‘একটা হাতি আঁকো,’ সে যথাসীতি একটা হাতি আঁকে । দেখা যায়, তার বস্তুগত একটা জ্ঞান আছে । হাতিটা সে একটা শুঁড় করে । এর পর তাকে যদি কিছু রং দেওয়া হয়, দেখা যাবে এটায় রং লাগাচ্ছে, ওটায় রং লাগাচ্ছে, এখানে দেখা যাবে, যত রং আছে সবই প্রায় ব্যবহার করে ফেলেছে । এনার মনটা সে শিক্ষকের কাছে যায়, তখন তাকে বোঝানো হয় যে কাজে এখানে প্রাইমারি কালার । এই কটা রং দিয়ে প্রধানত ছবি আঁকতে হয় । সব রং ব্যবহার করতে হয় না । হাতে তোমার পেঙ্গল আছে এলে সমস্ত কিছু আঁকে ফেলবে, তা তো নয় । একজন বড় চিত্রশিল্পী এলোজেলো, ‘ছবি আঁকতে গেলে যত রেখা আঁকতে হয় তার চেয়ে





মুজতে ওয়াশিংটন।' অর্থাৎ ইরেজ করতে হয়। সবগুলো রেখা মূল্যবান  
 না।।। সবচেয়ে কম রেখার মধ্যে দিয়ে সব থেকে অপরূপ ছবি পিকাসো  
 আঁকে গেছেন। পিকাসো-র আঁকা শান্তির পায়রা। কী অদ্ভুত ছবি।  
 মাএ কয়েকটা আউটলাইন। এই যে শিল্পকলার মূল শর্ত, যে আমি  
 আঁকছি, কাকে আঁকছি, কী দিয়ে আঁকছি, কাদের জন্য আঁকছি—এই  
 কথাগুলো যাদের খেয়াল থাকে, লোকশিল্পীদের এই খেয়ালটা থাকে,  
 কারণ সে জানে এই লক্ষ্মীসরাটা আঁকলে কোজাগরী পূর্ণিমাতে সেটা  
 বিক্রি হবে এবং কালীঘাট অঞ্চলের লক্ষ্মীসরা কিনতে গেলে দেখতে  
 পাবেন যে ওপরে লক্ষ্মীর মূর্তি, তলায় মা কালীর মূর্তি, কারণ দীপাঙ্ঘিতা  
 অমাবসায় লক্ষ্মীপূজা হয়। কাজেই যে সরাগুলো আমরা বাজারে  
 দেখি বা টাঙিয়ে রাখি, শুধু তা টাঙিয়ে না রেখে তার সামাজিক  
 তাৎপর্য জানা চাই। জীবনকে ইন্টারপ্রেট করার ক্ষমতা সবচেয়ে  
 বেশি লোকশিল্পীদের মধ্যে আছে। মুশকিল হল, সভ্যতা যখন এর  
 ওপর এসে হানা দেয়। যেমন ধরুন, আমাদের যখন মসজিদ হয়নি,  
 মন্দির হয়নি, আমরা যখন ইট তৈরি করতে শিখিনি, পোড়ামাটির  
 কোনো জিনিস তৈরি শুরুই হয়নি হয়তো, সেই সময়ে আমাদের  
 মন কিছু হত বাঁশ আর কাঠ দিয়ে। কাজেই প্রত্যেক গ্রামে গেলে  
 দেখবেন, সবচেয়ে পুরনো জিনিস এটা আছে, তা আটচালা। খুব  
 পুরনো শিল্প। বীরনগরে গেলে দেখতে পাবেন এখনও আছে। কী  
 অপূর্ণ আটচালা। তার মধ্যে শিল্পকাজ রয়েছে বাঁশের কঞ্চির,  
 কাঠের—সব অসাধারণ। পরে ঐ লোকশিল্পগুলোর আদলে  
 আমাদের মন্দির-মসজিদগুলো তৈরি হয়েছে।

একজন ব্রিটিশ শিল্পতাত্ত্বিক দুঃখ করে বলছেন যে, এ দেশে

ব্রিটিশ এসে কী লাভ হয়েছে জানি না, কিন্তু লোকশিল্পের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে। কেন? বলেছেন, ‘মন্দিরের ওপর যে চূড়া, মসজিদের ওপরে যে গম্বুজ এবং মিনার, তার সৌন্দর্য, তার নিজস্বতা, তার দেশীয়তা নষ্ট হয়ে গেল, যবে থেকে ব্রিটিশরা এল।’ ব্রিটিশরা থামের কাজ আনল, থাম। ব্রিটিশরা দিয়েছে থ্রেকো-রোমান স্থাপত্যবিদ্যা। কৃষ্ণনগর কলেজে দেখতে পাবেন বড়-বড় থাম। কলকাতা সেনেট হলে বড়-বড় থাম। হাইকোর্টে গেলেও দেখা যাবে। এই যে থামের ধারণা এসে গেল, সেই থেকে গম্বুজের মর্যাদা চলে গেল। মসজিদের গম্বুজ এবং মিনার কমে গেল। থামের প্রকোপ এল। ব্রিটিশরা যদি কিছু ক্ষতি করে থাকে, শিল্পতাত্ত্বিকরা বলছেন, জার্মান শিল্পতাত্ত্বিক হাইনরিস বিমার তাঁর বইয়ের মধ্যে লিখেছেন—ব্রিটিশদের করা সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে যে তারা ভারতীয় শিল্পকলাকে নষ্ট করে দিয়েছে, থামের সংস্কৃতি নিয়ে আসায় এই জাতীয় বহুতর চর্চা, বহুতর অভিজ্ঞতা নিয়ে মানুষ আর শিল্পের দিকে এগোতে পারে না। সে জন্য লোকসমাজে, লোকধর্ম, লোকচিত্র গুরুত্বপূর্ণ। আজকে যদি কোনো পটুয়ার কাছে যাই, দেখা যাবে সে মোটেই আর পুরনো কাপড় আঠা দিয়ে সঁটে ছবি আঁকে না। সে বাজার থেকে তুলোট কাগজ কিনে নেয়। দেখা যাবে, সে আর ছাগলের লোম দিয়ে তুলি বানায় না, সে বাজার থেকে তুলি কিনে নেয়। উনুনের মাটি দিয়ে হলুদ রং বানায় না, রং কিনে নেয়। দেশি রং উঠে যাচ্ছে। দেশীয় বর্ণপ্রকরণ উঠে যাচ্ছে। আগেকার দিনে পুঁইমিচুরির রংটা ব্যবহার হত, এখন আর তা হয় না। উজ্জ্বল রং এসে গেছে তার জায়গায়। বীরভূমের বেশ কিছু গ্রামে গেলে দেখা

মানে, দুর্গাপূজার কোনো ঠাকুর তৈরি হয় না। একটা কাঠামো তৈরি  
 হয় চালাচিহ্নের মতো। ধরা যাক, আট ফুট মতো উচ্চতা, গোল।  
 তার ওপর মোটা মার্কিন কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল, সেটা দুর্গাপট।  
 সেখানেই লক্ষী সনাতনী সন আঁকা আছে। পটটা যে বাড়িতে পুজো  
 হচ্ছে, সেখানে রাখা থাকে। পনের বছর বিসর্জন দিয়ে আবার নতুন  
 পট এসিয়ে দেয়। আমি চালাচিহ্ন নিয়ে কাজ করছি, দেখলাম, সব  
 একমুঠি একেছে। যজ্ঞ-টঙ্ক, ঐ শিবের বাড়ি-টাড়ি একেছে, কিন্তু  
 শিবকে লক্ষা করে শুইয়ে দিয়েছে। ঐ চালাচিহ্নের একটা বড় অংশ  
 নিয়ে নিয়েছে শিব। তখন আমি রসিকতা করে বললাম, ‘এ কী!  
 শিব গজিকাভুঙ, গাঁজা খেয়ে শিব শুয়ে পড়েছেন নাকি?’ বলল,  
 ‘না না, পয়সা দিলেই শিবকে আবার বসিয়ে দেব।’ আমি বললাম,  
 ‘তার মানে?’ বলল, ‘টাকা তো দেবে একশো টাকা। শিবকে যদি  
 এসাই, তা হলে তো অনেকগুলো ফিগার আঁকতে হবে। জায়গাটা  
 ওরাখান জনা শিবকে শুইয়ে দিয়েছি।’ এই লোকটার দিকে আমি  
 মগন তাকালাম, তখন বুঝলাম যে লোকসমাজ এবং লোকশিল্পের  
 একেবারে ভেতরের লোকটার কাছে আমি পৌঁছে গেছি। অর্থনীতির  
 সবচেয়ে বড় সংকটটা আমার সামনে তুলে ধরল সে। বলল, ‘এত  
 বড় একটা ঠাকুর একে একশো টাকা। ধরুন, আমি পাঁচখানা ঠাকুর  
 আঁকব, পাঁচশো টাকা। বছরে একবারই তো পেলাম। আপনার কি  
 মনে হয় শিবের কারিকুরি দেখানো সম্ভব নাকি?’ আমি বললাম,  
 ‘অসম্ভব না।’ আস্তে-আস্তে শিব যদি উঠেও যায়, ঐ জায়গায় যদি  
 লক্ষা আসতে আরম্ভ করে, বুঝতে হবে লোকসমাজের মধ্যে  
 বিপ্লবাতা এসেছে। লোকসমাজের অর্থনীতির কাঠামো ভেঙে

পড়েছে। পাঁচমুড়ার ঘোড়া একদিন নষ্ট হয়ে যাবে, ঐ মাটি শেষ হয়ে গেলেই। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে, এখন ঠাকুর করছে হরেক জাত। পালোদের মধ্যে ভট্টাচার্য, সেনগুপ্ত, বসাক, সব ঢুকে পড়েছে। অন্য সমাজের বেকারত্ব কুস্তকার বৃত্তি বাড়িয়ে দিয়েছে। কুমোররা কোথায় গেল? তারা সব চাকরি-বাকরি করতে চলে যাচ্ছে। তাদের জন্মার্জিত কয়েক প্রজন্মের যে শিল্পকলা—সে তো অবশ্যই আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে।

কাজেই আজকে এখানে যাঁরা আলোচনার আয়োজন করেছেন, যারা শুনে এসেছেন, আমাকে ডেকেছেন দু-চার কথা বলার জন্য, আমি তাঁদের কাছে আমার অভিজ্ঞতালব্ধ কথাগুলোই বললাম। এগুলো সত্য, এর মধ্যে কোনো ভেজাল নেই। এগুলো কোনো বই পড়ে জানার নয়। বই পড়ে সহায়ক বিদ্যাটা অর্জন করেছি মাত্র। কিন্তু শিল্পীরা কী ভাবে গ্রামের মধ্যে প্রতিদিন লোকশিল্পকে, আর্টের কনসেপ্টকে ভেঙে দিচ্ছে, তাকে নতুন করে দেখছে, তা জেনেছি। কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয়, আমাদের পাড়ায় যে পুজোটা হয়েছে, রাস্তার দু-পাশে দেখলাম বিভিন্ন পসরা সাজিয়ে বসেছে। দেখলাম, নতুনগ্রামের মৃৎশিল্পীরা পঁেঁচা, গৌরাঙ্গমূর্তি নিয়ে বসেছে। আমার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথা মনে পড়ে গেল—হেড আর হ্যান্ড-এর সম্পর্ক আজও হয়নি। লোকশিল্পকে যদি সমাজের শিল্প করতে হয়, তবে সবচেয়ে আগে লোকশিল্পীদের শিক্ষিত করতে হবে।

৯ নভেম্বর, ২০০৮

শান্তিপুর পৌর উচ্চ বিদ্যালয়ে (রবীন্দ্র স্মৃতি ভবন) প্রদত্ত বক্তৃতা

ললিতমোহন সেনের (১৮৯৮-১৯৫৪) মতো  
বিচিত্রকর্মা শিল্পী ও প্রথিতযশা শিক্ষক এ দেশে খুব  
বেশি জন্মাননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দেশের  
স্বভাব-অনুযায়ী তাঁর নাম অধুনা প্রায় বিস্মৃত। তাঁর  
মূল শিল্পকর্ম প্রায় দুর্লভ। মৃত্যুর পর অনিবার্য কারণে  
সে সবই নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে। এত  
কাল পরে যা সম্পূর্ণত উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব। তবু  
ঐতিহাসিক কারণেই তাঁর স্মৃতিরক্ষা করা আমাদের  
কর্তব্য। বস্তুত সে কারণেই এই স্মারক বক্তৃতামালার  
আয়োজন। ললিতমোহনের জন্মদিনটিকে মনে রেখে  
আয়োজিত প্রথম বক্তৃতাটি দিয়েছেন স্বনামধন্য লেখক  
সুধীর চক্রবর্তী, এখানে তারই মুদ্রিত রূপ।  
ললিতমোহনের বিপুল শিল্পকাজ ও লেখাপত্রের যেটুকু  
আজও কালের গ্রাস এড়িয়ে টিকে আছে, চেষ্টা করা  
হচ্ছে তা জনসমক্ষে হাজির করার। আপাতত এটুকু  
করতে পারলেই ললিতমোহনের স্মৃতির প্রতি যথার্থ  
সুবিচার করা হবে।